প্রথম আলো

তারিখ ...20 AUG 2015...
পৃষ্ঠা ...২... কলাম ...৭......

৭৮ শতাংশ সরকারি বিদ্যালয়ে কোচিং বাধ্যতামূলক

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোচিং বেআইনি হলেও সমাপনী পরীক্ষা চালুর পর তা বেড়েছে। শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য গত বছর দেশের ৮৬ দশমিক ৩ শতাংশ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের কোচিং করতে হয়েছে। আর ৭৮ শতাংশ সরকারি বিদ্যালয়ে কোচিং ছিল বাধ্যতামূলক।

শিক্ষা নিয়ে কাজ করে, এমন বেসরকারি সংস্থার মোর্চা গণসাক্ষরতা অভিযানের একটি গবেষণা প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী বর্তমানে দেশের সবচেয়ে বড় পাবলিক পরীক্ষা। গত বছর এই পরীক্ষায় প্রায় ২৭ লাখ শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছিল।

প্রতিবেদনে বলা হয়, পাসের হার বাড়াতে খাতায় নম্বর বাড়িয়ে দেওয়া, প্রশ্নপত্র ফাঁসসহ নানা অনিয়ম হচ্ছে। পরীক্ষার হলে দেখাদেখি করে লেখা এবং উত্তরপত্র মেলানোর জন্য শেষের ৪০ থেকে ৬০ মিনিট অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

গতকাল বুধবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে এলজিইডি ভবনে একটি অনুষ্ঠানে 'প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা কোন পথে' শিরোনামে এ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

অনুষ্ঠানে গবেষণা দলের প্রধান সমীর রঞ্জন নাথ বলেন, ২০০৯ সাল থেকে পঞ্চম শ্রেণি পড়া শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে এই পরীক্ষা চালুর পর থেকে কোচিং বাড়ছে। ২০০০ সালে ৩৯ দশমিক ৪ শতাংশ বিদ্যালয়ে এই শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা কোচিং করত। গত বছর তা বেড়ে হয়েছে ৮৬ দশমিক ৩ শতাংশ। এতে শিক্ষার্থীদের ব্যয়ও বেড়েছে। এই পরীক্ষার জন্য প্রাইভেট পড়ার নির্ভরশীলতা বাড়ছে, পাঠ্যবইকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে গাইডবই। শিশুরা শেখার আনন্দ পেতে এবং সৃজনশীল হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

জানতে চাইলে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আলমগীর *প্রথম আলো*কে বলেন, টাকার বিনিময়ে বিদ্যালয়ে কোচিং করানো অন্যায় এবং অপরাধ।

প্রতিবেদনে বলা হয়, বিদ্যালয়গুলো বছরে গড়ে ৪১২ ঘণ্টা কোচিং করায়। আর ৪৪ শতাংশ বিদ্যালয়ের সব শিক্ষকই কোচিংয়ে পড়ান। কোচিংয়ের পাশাপাশি ৬৩ শতাংশ বিদ্যালয় নিজ উদ্যোগে মডেল টেস্টের আয়োজন করে।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা

গণসাক্ষরতা অভিযানের গবেষণা প্রতিবেদন

- পাসের হার বাড়াতে খাতায় নম্বর বেশি দেওয়া হয়
- উত্তরপত্র দেখাদেখির কারণে পরীক্ষার হলে শেষ ৪০-৬০ মিনিট অরাজক পরিস্থিতি থাকে
- গত বছর বিদ্যালয়গুলো গড়ে ৪১২ ঘণ্টা কোচিং করায়
- গাইডবই পাঠ্যবইকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে
- প্রাইভেট পড়ার ওপর নির্ভরশীলতা বাড়ছে

---

৭৮ শতাংশ সরকারি বিদ্যালয়ে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আবার জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির (নেপ) প্রশিক্ষণ ও নির্দেশনা অনুসরণ করে পরীক্ষকেরা উদারভাবে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করেছেন।

দক্ষিণ এশিয়ার অন্য কোনো দেশে পঞ্চম শ্রেণিতে পাবলিক পরীক্ষা হয় না জানিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়, পরীক্ষার্থীদের একটি অংশের বাধাহীন অসদুপায় অবলম্বন এবং নকল করার মহোৎসব অন্যদের ওপর খারাপ প্রভাব ফেলছে।

অনুষ্ঠানের সভাপতি শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির কো-চেয়ারম্যান কাজী খলীকুজ্জমান আহমদসহ কয়েকজন শিক্ষক, অভিভাবক ও বক্তা এই পরীক্ষা বাতিলের দাবি জানান।

সূচনা বক্তব্যে গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধূরী বলেন, পঞ্চম শ্রেণিতে বৃত্তি পরীক্ষায় সব শিক্ষার্থী অংশ নিতে পারত না। এই বৈষম্য দূর করার কথা বলে সমাপনী পরীক্ষা চালু করা হয়। কিন্তু এই পরীক্ষার নামে আরও বৈষম্য করা হচ্ছে কি না, তা ভেবে দেখার সময় এসেছে।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমানও প্রতিবেদনের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত পোষণ করেন। তবে এই পরীক্ষা বাতিলের বিষয়ে তিনি একা কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না বলে জানান। এটা সরকারকে ভাবতে হবে। এ ছাড়া শতভাগ পাসের জন্য কোনো চাপাচাপি করা হয় না বলে তিনি জানান।

গত বছর অনুষ্ঠিত প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ওপর ভিত্তি করে গবেষণা প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে। গবেষণাটি পরিচালিত হয় গত ২৪ অক্টোবর থেকে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত। গ্রামীণ ও শহর এলাকার ১৫০টি উপজেলা বা থানার ৫৭৮টি বিদ্যালয় নিয়ে এ গবেষণা করা হয়।

গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে (বাঁ থেকে) শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির কো-চেয়ারম্যান কাজী খলীকুজ্জমান, প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান এবং গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধূরী ● ছবি : প্রথম আলো

শুরু থেকেই অনিয়ম : প্রতিবেদনে বলা হয়, নিবন্ধন ফি ৬০ টাকা হলেও ৩৪ দশমিক ৩ শতাংশ পরীক্ষার্থীকে এর চেয়ে বেশি টাকা দিতে হয়, যা সর্বোচ্চ ৬০০ টাকা পর্যন্ত। নিবন্ধনের সময়ই 'দুর্বল' পরীক্ষার্থীদের 'সবলদের' মাঝখানে রেখে তালিকা তৈরি করে উপজেলা কার্যালয়ে পাঠানো হয়। উপজেলা কার্যালয় থেকে এর কোনো পরিবর্তন করা হয় না। এর ফলে পরীক্ষার সময় 'সবলদের' কাছ থেকে সহযোগিতা নিতে 'দুর্বল' পরীক্ষার্থীদের জন্য সুযোগ তৈরি হয়। ৬০ থেকে ৬৫ শতাংশ পরীক্ষার্থী অপরের সাহায্য ছাড়াই পরীক্ষা দেয়। অবশ্য এদের কাছ থেকে বাকিদের সাহায্যের দ্বার উন্মুক্ত ছিল। পরিদর্শকেরা পরীক্ষার হলে মুঠোফোন ব্যবহার করেন এবং খুদে বার্তার মাধ্যমে হলের বাইরে থেকে প্রশ্নের উত্তর বহন করেন। তাঁরা প্রশ্নের উত্তর বলে দিয়ে বা ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে দিয়ে পরীক্ষার্থীদের সাহায্য করেন। পরীক্ষার্থীরা যেন একে অন্যের উত্তরপত্র দেখে লিখতে পারে পরিদর্শকেরা সে সুযোগও করে দেন

প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টিও উঠে এসেছে প্রতিবেদনে। এ বিষয়ে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তারা দাবি করেছেন, তাঁদের দিক থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। এ জন্য তাঁরা নেপ ও সরকারি ছাপাখানাকে (বিজি প্রেস) দায়ী করেছেন।

পরীক্ষায় দেখা গেছে, ভাষার ক্ষেত্রে (বাংলা ও ইংরেজি) পরীক্ষার্থীরা খারাপ ফল করছে। ইংরেজিতে ৪২ দশমিক ৮ শতাংশ শিক্ষার্থী লেটার গ্রেড 'সি' বা 'ডি' পেয়েছে। মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরাও আরবিতে খুব খারাপ ফল করেছে।

প্রতিবেদনে শ্রেণিকক্ষের শিখনের মান বাড়ানো, বিদ্যালয় ও পরীক্ষার হলে অসদুপায় অবলম্বন বন্ধ করা, সমাপনী পরীক্ষা স্থানীয়ভাবে নেওয়া, শিক্ষকদের সম্মান ও ক্ষমতায়নে জোর দেওয়াসহ কয়েকটি সুপারিশ করা হয়।